Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-X, Issue-II, January2022, Page No.10-18
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

তিন নারীর স্বর তিন উপন্যাসে : ঔপন্যাসিক যখন বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্র

ইতিষা নন্দী
এম এ বাংলা, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

Literature, a wonderful reflection of continuous life is a candid mirror of society. Putting the demands of society in front Bankimchandra, Rabindranath and Saratchandra created three female characters – Kundanandini, Binodini and Achala. Keeping eyes on the pages of their complicated lives content is revealed. This content ties the knot of three characters in one thread keeping aside their different natures. On the other hand, illegal love which was forbidden in earlier society becomes as normal as simple incident happening in our drawing room. Due to illegal affair Bankim makes responsible Kundanandini for breaking the root of family relationships as Brishabriksha. On the other hand, Rabindranath expresses the complicated inner feelings of heart through his character of Binodini as a representative of 'Chokher Bali'. Similarly, Saratchandra persuades the readers keeping the character Achala as a pendulum between the demand of society and mind of human being. If rules are not maintained properly society is destroyed and to revive soul demands of mind should be maintained. As a consequence 'Grihadaha' is written. Three novelists show us how to break traditional customs and change the definition of relationship to revive the inner feelings of heart. Illegal affair becomes an inseparable organ in their continuous life. They are floating in the stream of their affair. To untangle the thread of illegal love and the calm down their turbulent life these three novelists think about Widow Marriage.

Keywords: Society, Novelists, Female characters, Kundanandini, Binodini and Achala. Illegal love, Pendulum, Traditional customs, Widow Marriage

একটা প্রবন্ধ যদি প্রকৃষ্টরূপে বন্ধনের স্বরূপ হয়; একটা নাটক যদি কতকগুলো সংলাপের আসর হয়; একটা উপন্যাস যদি কতকগুলো ছোটোগল্পের মালাকর হয়, তাহলে একটা অনুগল্প হল চরিত্রদের দৈনন্দিন জীবনে ঘটে চলা বহু অভিজ্ঞতাকে বাদ দিয়ে একটা অনুভূতির স্তূপ। এর বেশিরভাগ

ক্ষেত্রেই শিল্পী তাঁর শিল্পীত্ব মনে এমন অনেক নারী চরিত্রদের আবির্ভাব ঘটান যারা নাকি রূপে লক্ষী গুনে সরস্বতী। এমন-ই তিন ঔপন্যাসিকের হাতে সৃষ্ট আমাদের অতি পরিচিত তিন নারী চরিত্র হল- কুন্দনন্দিনী, অচলা, বিনোদিনী। কিন্তু তার সত্ত্বেও তাদের পরশ মাত্রই সময় ও সমাজের অহল্যার মতো শাপমুক্তি ঘটেনি। বরং তাদেরই বিরুদ্ধে সমাজের মনে জট পেকেছে বহু প্রশ্নের। আর সেই জট খোলার দায়ও পরেছে তাদেরই উপর। তার সমাধান করতেই সময় ও সমাজের নিরিখে এবং শিল্পীর শিল্পীত্ব মনের চাহিদায় কেউ কারোর থেকে এগিয়ে গেছে, কেউ বা পিছিয়ে গেছে আবার কেউ বা হাঁপাতে হাঁপাতে মাটিতে বসে একটু দম নিয়েছে। কিন্তু এই তিন ঔপন্যাসিক এই তিনজনকে কীভাবে যেন একে অপরের পরিপূরক করে জন্ম দিয়েছেন। বুঝিয়ে দিয়েছেন সমাজ এই তিনজনকেই দেখতে চেয়েছিলো। সমাজের কাছে এই তিনজনের ই প্রয়োজন আব্যশিক ছিলো। সেই প্রসঙ্গেই দু-চার কথা বলতে সাহসী হয়েছি আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার মধ্যে।

প্রত্যেক সাহিত্যিক-ই কলম ধরার আগে একটা পরিকল্পনা গড়ে তোলেন। সেটা হতে পারে কোনো একটা চরিত্রকে কেন্দ্র করে বা একটা বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বা কোনো মনস্তত্ত্বের জালকে বিস্তার করে। পরে তা জাল গোটানোর মতো পর্যায়ক্রমিকভাবে পরিসমাপ্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যান। এ ক্ষেত্রে তিন ঔপন্যাসিক পরিপূর্ণভাবে একে অপরের থেকে স্বতন্ত্র। তাই দেখি বঙ্কিম যদি পর্বতের মতো রুক্ষ্তা ও কাঠিন্যতা নিয়ে নিজের পরিকল্পনাকেই চরম পরিসমাপ্তি বলে স্বাক্ষর করে দেন; তাহলে রবীন্দ্রনাথ মালভূমির মতো আবেগপ্রবনতা নিয়ে পাঠকের মনের সাথে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে একটু সময় নিয়ে ভাবতে বসেন। আর শরৎচন্দ্র? তিনি তো সমভূমির সরলতা নিয়ে আমাদের চারেপাশের চেনা চরিত্রকেই নতুন করে চেনাতে বসেন। তাঁর কাছে তো আবদার করাই যায়- শরৎবাবু, আমার মতো একটা সাধারন মেয়ের গল্প লেখো তুমি।

আমরা যেমন কোনোকালের সমাজ ও সময়কে উপেক্ষা করতে পারি না; ঠিক তেমনি কোনোকালের সময় কোনো সমাজ এটা উপেক্ষা করতে পারে না যে, মেয়ে মানুষের ভীষন বালাই। আর সেই সমাজের দায়বদ্ধতার ফলশ্রুতিতেই তৈরি হয় একজন সাহিত্যিকের সাদা পাতার উপর হিজিবিজি অক্ষরের। তাই দেখি তিনটি সময়ের দাবিতে সৃষ্ট হয়েছে তিনটি উপন্যাসের- বিষবৃক্ষ, চোখেরবালি এবং গৃহদাহ। এই তিন উপন্যাস প্রতিনিধিত্ব করেছে তিন সময়কে। এক্ষেত্রে বঙ্কিম যদি ১৮৭৩ এ পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দাপটকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার দাবিদার হন তাহলে রবীন্দ্রনাথ ১৯০৩ তে সেই দাপটকেই সমান তেজ ও দ্বীপ্তিতে ফিরিয়ে দিয়েছেন নারীর আঙ্গুলের ডগায় আর শরৎবাবু ১৯২০ তে দাড়িয়ে নারী-পুরুষের দাবীর লড়াইকে পিছনে ফেলে মানুষের দাবিতে সমাজকে একটা পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছেন- অনেক হয়েছে এবার বলো তো জীবনের আশ্রম ও আশ্রয়ের মধ্যে ঠিক পার্থক্যটা কোথায়?

নামকরণ-ই নাকি চরিত্রের দ্যোতক, জন্ম নেওয়া শিশুর প্রথম পরিচায়ক। তাই সমাজ ঘটা করে পালন করা জন্মদিনের মতো নামকরনের উৎসবকেও অভ্যর্থনা জানায় সাদরে। আর সাহিত্য যদি সমাজেরই ধারক ও বাহক হয় তাহলে সে-ই বা উপেক্ষা করে যায় কি প্রকারে? তাই দেখি এই তিন

ঔপন্যাসিকের হাতে সৃষ্ট তিন শিল্প নিজেদের নামকরনের মহিমায় সমুজ্জ্বল ও সন্তুষ্ট। এক্ষেত্রে বঙ্কিমের হাতে যদি গৃহস্থ যাপনের ভিত্তিভূমি দুলে ওঠার কারন স্বরূপ বিষবৃক্ষ = কুন্দ হয় তাহলে রবির হাতে মনের টানে একঘেঁয়েমিকতা কাটিয়ে জীবনে লঙ্কামরিচের স্বাদ ফেরাতে মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে থাকে চোখের বালি = বিনোদিনী। আর এই দুই-এর সন্ধিক্ষনে ঘড়ায় তোলা জলের সীমাবদ্ধতা ও সাঁতার কাটা দীঘির পরিব্যপ্ততার মাঝে পরে পেণ্ডুলামের মতো দুলতে দুলতে অবশেষে শরৎবাবু অচলার সাজানোর তাসের ঘরেই আগুন ধরিয়ে দেন, আর পাঠকেরা বিস্ফারিত চোখে দেখতে থাকে অচলার গৃহদাহ।

বঙ্কিমচন্দ্র বিষবৃক্ষ উপন্যাসটি রচনা করেছেন ১৮৭৩ সালে। সেই সময় তিনি সমাজের বাস্তব সমস্যাকে উপন্যাসে ঠাঁই দিতে গিয়ে বেশ কিছু সামাজিক সমস্যাকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন – স্ত্রীশিক্ষার প্রসার, পৌত্তলিকতা বিদ্বেষ, বাল্যবিবাহ, মদ্যপান, বহুবিবাহ – এই সব কিছুর মধ্যে প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিলো বিধবা বিবাহ। এই সমস্যাকে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে স্বীকৃতি দিতে ও সমাজকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে অগ্রসর করতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগার ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহকে আইনসম্মত হিসেবে বিল পাস করলেও তৎকালিন সমাজ রক্ষকরা তা মানতে রাজি ছিলেন না। কারন তাঁরা সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এই ধারনা প্রোথিত করেছিলেন যে, নারীরা ঘরের সামগ্রী, বাইরের পুরুষের সামনে তারা সম্পূর্ন অনভিপ্রেত। পুরুষশাসিত সমাজে পুরুষদের অঙ্গুলি হেলনে নারীরা চলতে বাধ্য। তাদের রাজ্যত্ব কেবল অন্তপুরের শিকল পর্যন্ত বন্দী। বাইরের জগৎ এর কাছে তারা রুদ্ধদ্বার। তাই বিধবা বিবাহ আইন পাশ করা শাস্ত্রসম্মত হলেও তা সমাজ সম্মত নয়। তাই এই আইন নারীদের পায়ের মাটিকে শক্ত করতে চাইলেও নারীরাই তাকে অগ্রাহ্য করেছে ব্যঙ্গ ভরে। যার প্রমান পাই সূর্য্যমুখী কর্তৃক কমলমনিকে লেখা চিঠিতে – "আর একটা হাসির কথা! ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগার নামে কলিকাতাতে কে না কি বড় পন্ডিত আছেন, তিনি আবার একখানি বিধবা বিবাহের বহি বাহির করিয়াছেন। যে বিধবার বিবাহের ব্যবস্থা দেয়, সে যদি পন্ডিত হয়, তবে মুর্খ কে?"[১] সমাজের নিয়মযন্ত্রের যাঁতাকলে পিশে মরা সুর্য্যমুখীদের মতো নারীদের মানসিকতা-ই সাহস দিয়েছিল সমাজের সেই সমস্ত প্রভাব প্রতিপত্তিদের যারা নিজেদের সমাজের রক্ষক ও ভক্ষক হিসেবে দাবি করে। সমাজের সমস্ত আইনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখাতে যারা প্রস্তুত। বলা ভালো তারাই যেন নিজদের মতো করে সমাজের আইন তৈরী করে ও প্রয়োজন মতো ধ্বংস করে। যার প্রমান স্বরূপ দেখি নগেন্দ্র দত্ত কুন্দনন্দিনীকে বিবাহের প্রাক্কালে শ্রীশচন্দ্রের পত্রের উত্তরে জানিয়েছে - "যদি কেহ বলে যে, বিধবা বিবাহ হিন্দুধর্ম বিরুদ্ধ, তাহাকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রবন্ধ পড়িতে দিই। সেখানে তাদৃশ শাস্ত্রবিশারদ মহামহোপাধ্যায় বলেন যে, বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসম্মত, তখন কে ইহা অশাস্ত্র বলবে? আর যদি বল শাস্ত্রসম্মত হইলেও ইহা সমাজ সম্মত নহে, আমি এ বিবাহ করিলে সমাজ চ্যুত হইব; তাহার উত্তর, এ গোবিন্দপুরে আমাকে সমাজচ্যুত করে কাহার সাধ্য? যেখানে আমিই সমাজ, সেখানে আমার আবার সমাজচ্যুতি কি? তথাপি আমি তোমাদিগের মনোরক্ষার্থে এ বিবাহ গোপন রাখিব- আপাতত কেহ জানিবে না"[২]। তৎকালিন সমাজে নগেন্দ্রের মতো পুরুষদের চিত্ত সংযমের অভাবের ফলস্বরূপ সমাজের বুকে জন্ম নেয় বিষবৃক্ষের । যার অঙ্কুর থেকে পরিনতি পর্যন্ত প্রত্যেক পর্যায়ে সমাজের পসার

সাজানো প্রশ্নের ডালির কৈফিয়ৎ দিতে কাটগোড়ায় দাঁড়াতে হয় কুন্দনন্দিনীদের। তাই দেখি সুর্য্যমূখী কর্তৃক বহিষ্কৃত কুন্দকে হীরা বশীভূত ক'রে সুর্য্যমূখী নগেন্দ্রের হরিহর আত্মাকে অভিন্ন করতে চেষ্টা করে। যার পরিনতিতে সৃষ্টি হয় দুই ত্রিকোন প্রেমের মানচিত্র। সুর্য্যমূখীর সুখ নগেন্দ্রনাথে; নগেন্দ্রনাথের সুখ কুন্দনন্দিনীতে। অন্যদিকে হীরার সুখ দেবেন্দ্রনাথে; আর দেবেন্দ্রনাথে সুখ কুন্দনন্দিনীতে। অর্থাৎ তাদের সবার সুখের স্থান হয়ে দাঁড়ায় কুন্দনন্দিনী। আর সেই সুখ খুঁজতে গিয়ে যে যে কুন্দর সংস্পর্শে এসেছে তারা সকলেই বিষের জ্বালায় বেদনাপ্লুত হয়ে জর্জরিত হয়েছে। তাই সমাজের শাসনদন্ডকে মাথায় রেখে বিষবৃক্ষের অঙ্কুরকে গোড়া থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র বিষবৃক্ষের বিষেই বিষবৃক্ষকে ধুলিস্যাৎ করতে বাধ্য হয়েছেন – "যেমন বহুদীপসমুজ্জ্বল বহুলোকসমাকীর্ণ, গীতধ্বনিপূর্ণ নাট্যশালা নাট্যরঙ্গ সমাপন হইলে পর অন্ধকার, জনশূন্য, নীরব হয়; এই মহাপুরী সুর্য্যমূখীনগেন্দ্র কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া, সেই রূপ আধার হইল। যেমন বালক, চিত্রিত পুত্তলি লইয়া একদিন ক্রীড়া করিয়া, পুতুল ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দেয়, পুতুল মাটিতে পড়িয়া থাকে, তাহার উপর মাটি পড়ে, তৃণাদি জন্মিতে থাকে; তেমনি কুন্দনন্দিনী, ভগ্ন পুতুলের ন্যায় নগেন্দ্র কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া একাকিনী সেই বিস্তৃতা পুরীমধ্যে অযত্নে পড়িয়া রহিলেন"[৩]।

ডা. সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত শরৎচন্দ্রের প্রধান নারী চরিত্রগুলির অন্তর্দ্বন্ধের একটি মডেল আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। সেটি হলো – 'প্রবৃত্তির সহিত সচেতন সংস্কারের সংঘাত'। এক্ষেত্রে যে সংঘাতে প্রবৃত্তি জয়লাভ করেছে সেখানেও কোনো স্থায়ী সুখ বা তৃপ্তি নেই বরং সর্বনাশের কিনারায় ঠেলে নিয়ে গেছে। আবার যেখানে প্রবৃত্তিকে ছাপিয়ে সংস্কার জিতেছে সেখানেও পরিনামে জুটেছে অন্তহীন বেদনা। তাই এই দ্বন্দ্বের কোনো স্থায়ী মীমাংসা হয়নি। সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত এই প্রসঙ্গে বলেছেন – "মীমাংসাহীন দ্বন্দ্বের মধ্যে নারীজীবনের সমস্ত ঐশ্বর্য, সমস্ত মহিমা নিঃশেষে নষ্ট হইয়া যাইতেছে তাহাই সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি"[৪]। শরৎ এর হাতে গৃহদাহের অচলাই বোধ হয় এই মীমাংসাহীন দ্বন্দ্বের নিষ্ঠুরতম শিকার। বিবাহিতা রমনী অন্যপুরুষের প্রতি মোহাবৃষ্ট হলেই সে অ-চলা হয়ে ওঠে না। এই অচলা বিনোদিনীর মতো প্রেম বঞ্চিতা বিধবা নয়; সে মহিমের বিবাহিতা স্ত্রী। কলকাতা শহরে মাতৃহীনা অচলা বেড়ে উঠেছে সম্পূর্ন ভিন্ন পরিবেশে। ব্রাহ্মপরিবারের আবহাওয়ায় সম্পূর্ন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যময়ী হয়ে। এই মাতৃহীনা মেয়েটাকে দাম্পত্য বন্ধন বা সমাজ ও সংসারের অনুশাসান নিয়ে উপদেশ দেওয়ার কেউ ছিল না। কেদার বাবুর মেয়েকে ভালোবাসার মধ্যে কোনো খাদ ছিল না। কিন্তু মেয়ের অন্তরের গভীরে যে আলোড়নে চলেছে সে সম্পর্কে তিনি উদাসীন। তাই অচলার দ্বন্দ্ব তার নিজের, দ্বন্দ্বের মূল সমাধানের দায়িত্বও তার। যখন-ই মহিম-অচলার ভাঙ্গা সম্পর্ক এক হতে গেছে তখনই সুরেশের আবির্ভাব সবকিছুকে তছনছ করে দিয়েছে। এখন প্রশ্ন – তখন অচলা কোথায় ছিলো? তার এই অস্থায়ী ভূমিকা-ই স্থায়ী চারিত্রিক দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে সব সংকটের মূলে গৃহের ভিত্তিভূমিকেই দুলিয়ে দিয়েছে। দুই বন্ধুর মধ্যে কাকে সে গ্রহন করবে? কে তার উপযুক্ত? পরিস্থিতির দাবিতে কাকে গ্রহন করা উচিত? – এই প্রশ্ন গুলির উত্তর সে সারাজীবনও সন্ধান করে উঠতে পারেনি। যার ফলশ্রুতিতে দুই বন্ধুর মাঝে পেন্ডুলামের মতো দুলতে দুলতে সম্মুখীন হতে হয় এক চরম মানসিক সঙ্কটের "যে দুই বন্ধু আজ অকস্মাৎ তাহার জীবনের এই সন্ধিস্থলে এমন পাশাপাশি আসিয়া দাঁড়ায়াছে, তাহাদের একজনকে যে

যাও, বলিয়া বিদায় দিতেই হইবে, বিন্দু মাত্র সংশয় নেই। কিন্তু কাহাকে? কে সে?”[৫] তার এই দ্বন্দ্বময় প্রশ্নই একদিকে যেমন মহিমের দাম্পত্যজীবন ও সুরেশের ব্যক্তিগত জীবনকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে অন্যদিকে মাত্র আঠারো বছর বয়সে যে অনভিজ্ঞ মেয়েটির জীবন যন্ত্রনার সূচনা হয় তাকে একুশ বছর বয়সেই এক ভয়ঙ্কর একাকীত্ব ও অন্ধকার ভবিষ্যতের সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দেয়। তাই তার প্রার্থনার মধ্যে কোনো প্রাপ্তির প্রত্যাশা ছিল না ; ছিলো শুধু নির্বিকার নিরাসক্তি – সে জীবনচক্রের স্রোতে এসে পৌছেছিলো এমন এক জায়গায় – “সেখানে ভয় নাই, ভাবনা নাই, কামনা নাই, কল্পনা নাই – যতদূর দেখা যায়, ভবিষ্যতের আকাশ ধূ ধূ করিতেছে”[৬]।

চোখের বালি উপন্যাসের প্রাথমিক নামকরন থেকে এই কথা অত্যন্ত স্পষ্ট যে রবীন্দ্রনাথ এই প্রথম উপন্যাসে একটি প্রখর নারী ব্যক্তিতের সৃষ্টি করেছেন। ‘দেবী নাহি, নাহি আমি সামান্যা রমনী’ উপন্যাস জগতে বিনোদিনীই বোধহয় প্রথম এ কথা বলতে পেরেছিল। এমন একটি নারী ব্যক্তিত্ব যে সুখ-স্বাছন্দ্য, প্রবৃত্তির প্রলোভন, এমনকী নিজের অধিকার বোধও হয়তো কিছু পরিমান ত্যাগ করতে পারে। কিন্তু তার ব্যক্তিত্বের অপমান ও অস্বীকার কখনই মেনে নিতে পারে না, ঠিক এই ব্যাপারটাই হয়েছে তার ক্ষেত্রে। রাজলক্ষ্মীর যখন প্রয়োজন হয়েছে তখনই বিনোদিনীকে ব্যবহার করেছে। তার পরিনতি কখনো ভেবে দেখেনি। বিহারী বিনোদিনীকে ভালোবাসার কথা কখনো ভাবেনি, বিনোদিনীর আচরনে আশা ব্যথিত হবে কিনা এই কথাই শুধু ভেবেছে। অর্থাৎ বিনোদিনীর থাকাটা যেন রাজলক্ষ্মীর ঈর্ষাবৃত্তির পরিতৃপ্তির জন্য, একদিকে আশাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য অন্যদিকে আশা যাতে আঘাত না পায় তা দেখার জন্য – এই সব কিছুর ওপরই তার মূল্য নির্ভরশীল। তার নিজের যে একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, তার নিজেরও যে ভালো লাগা-মন্দলাগার একটা ব্যাপার আছে এসব কথা কেউ ভাবেই নি। তাই নিজেকে ব্যহত হতে না দেবার জন্য বিনোদিনীর একার বিদ্রোহ-ই এই উপন্যাসের থিম – “বিনোদিনী নিজে কেহই নহে! আশাকে ঢাকিয়া রাখিবার জন্য, আশার পথের কাঁটা তুলিয়া দিবার জন্য, আশার সমস্ত সুখ সম্পুর্ণ করিবার জন্যই তাহার জন্ম! শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রবাবু আশাকে বিবাহ করিবেন, সেইজন্য অদৃষ্টের তাড়নায় বিনোদিনীকে বারাসতের বর্বর বাননের সহিত বনবাসিনী হইতে হইবে। শ্রীযুক্ত বিহারীবাবু সরলা আশার চোখের জল দেখিতে পারেন না, সেইজন্য বিনোদিনীকে তাহার আঁচলের প্রান্ত তুলিয়া সর্বদা প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে। একবার এই মহেন্দ্রকে, এই বিহারীকে বিনোদিনী তাহার পশ্চাতের ছায়ার সহিত ধুলায় লুন্ঠিত করিয়া বুঝাইতে চায় আশাই বা কে আর বিনোদিনীই বা কে। দুজনের মধ্যে কত প্রভেদ”[৭]। একজন নারী ব্যক্তিত্বকে শ্রদ্ধা করতে পারলে, স্বীকার করতে পারলে সুস্থ ভাবে আমার সঙ্গে মেশো, আমার অস্তিত্ব অন্যের উপর নির্ভরশীল যদি মনে করো, যদি আমাকে ব্যবহারের চেষ্টা করো তবে আমিও বুঝিয়ে দেবো তুমি আগুন নিয়ে খেলা করেছো – ঠিক এটাই যেন বিনোদিনীর নিরুচ্চার ঘোষনা। সে মহেন্দ্রের সঙ্গে মিশেছে, শুধু এইটুকুই বোঝানোর জন্য যে মহেন্দ্রের বৌঠানকে বাদ দিয়েও তার একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। নারী ব্যক্তিত্বের জাগরন এবং নীতি ও অন্যান্য অনুষজ্ঞ বাদ দিয়ে একটি নারীকে শুধু নারী হিসাবে স্বীকার, এটাই এই উপন্যাসের মূল কথ্য। চিত্রাঙ্গদা নাট্যকাব্যে রবীন্দ্রনাথের এই একই চিন্তা লালিত হয়েছে –

“পূজা করি রাখিবে মাথায়, সেও আমি

নই, অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে

পিছে, সেও আমি নহি। যদি পাশেই রাখ

মোরে, সংকটের পথে, দুরূহ চিন্তার

যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর

বাধিন ব্রতের তব সহায় হইতে,

যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী

আমার পাইবে তবে পরিচয়” [৮]।

উপন্যাস শেষ হবার পর পাঠককুল আলোচনা ও সমালোচনায় মধ্যে চন্ডীমন্ডপের আসরকে সরগরম করে তোলে। কিন্তু উপন্যাসের পরিসমাপ্তিতে পাঠকের সেই আসর জমিয়ে তোলার দায় পরে একজন ঔপন্যাসিকের ওপর। তাই তাকে প্রথম থেকেই তাঁর বুনন ক্রিয়ায় মনোযোগ দিতে হয়। কৌশলে ঢুকিয়ে দিতে হয় এমন বহু ঘটনার প্রাসঙ্গিকতা যেগুলিকে সমাজ এতদিন প্রসঙ্গের ধরাছোঁয়াতেই রাখেনি। এমন-ই একটা প্রসঙ্গ যেমন এই তিন উপন্যাসকে সময়ের সুদূর পার্থক্যতার সত্ত্বেও একসূত্রে গেঁথে দিয়েছে; ঠিক তেমনি নিজেকে চিন্তার বহির্বিশ্ব থেকে মানুষের ড্রয়িং রুমে এনে ফেলেছে। পাঠককে ভাবতে শিখিয়েছে আমিও তোমাদের আলোচনার বিষয় হতে পারি। সেটি হল অবৈধ প্রেম। এই অবৈধ প্রেমকে নিয়ে তিন শিল্পী ঝগড়া বেঁধেছে তিন শিল্পের পাতায়। তাতেই উঠে এসেছে যে অবৈধ প্রেমের জন্য বঙ্কিমের কাছে এক এবং একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদন্ড সেই অবৈধ প্রেম রবির কাছে স্বাভাবিক জীবনের ছন্দ - আঁতের কথা। আর শরৎবাবুও তো তাঁকে সাদরে সম্ভাষণ করে ঘরে এনে বসাতে চান তাঁর সাথে দুদন্ড আলাপ করবার জন্য। তাদের সেই ঝগড়ার আসরেই পাঠক দেখে বঙ্কিম যখন নিজের সিদ্ধান্তকেই সর্বোচ্চ বলে স্বীকার করাতে আদালতের জর্জের পোষাক পরতে উৎসুক তখন রবীন্দ্রনাথ মনস্তত্ত্বের অনুবীক্ষণ যন্ত্রে চোখ রেখে মানবমনের কারখানাঘরে লোহার পিটুনি ও হাপরের কাঁদুনিকে টেনে বার করে আনতে উৎগ্রীব। আর এঁদের ঝগড়ার মীমাংসা করতে দুজনের কথাকে মান্যতা দিয়েই শরৎবাবু বলেছেন শোনো, নিয়মের দাবি রক্ষা না করলে যেমন সমাজ বাচেঁ না তেমনি মনের দাবি রক্ষা না করলে আত্মা বাচেঁ না। মনে করিয়ে দিয়েছেন বিল পাসের মাধ্যমে নিয়মের মৃত্যুর রেজিষ্টারি করা হয়; আত্মার মৃত্যুর নয়।

সাহিত্যের আঙ্গিনায় যদি একটা নারীর Series দেখি তাহলে হয়তো ১৮৭৩ এ দাঁড়িয়ে এই রকম এক উপেক্ষিতা কুন্দকে আঁকা বোধহয় বঙ্কিমের উচিৎ হয়নি। কারন তার বিরুদ্ধে তোলা সমাজের অভিযোগ গুলো যেখানে বহুপূর্বে মাথা উঁচু করে আইনের হাত ধরে নিজেদের সপক্ষে বিল পাস করিয়ে নিয়েছে- সেখানে কুন্দকে নিরুপমাদের সারিতে দাঁড় করিয়ে হয়তো বলানো উচিৎ হয়নি-

আমি কি কেবল উপেক্ষিতের থলি? যতক্ষণ মোহ আছে ততক্ষণ আমার দাম? আর এর উত্তর দিতেই এবং বঙ্কিমকে একবার স্বরণ করিয়ে দিতেই বোধহয় রবির কলমে জন্ম নিয়েছে বিনোদ। যে কুন্দর ক্ষুদ্ধ মনের রুদ্ধ কথাকে নির্লজ্জ চিৎকারে ঘোষনা করেছে- "সংসারে যদি অপরাধী হইতে হয় তবে অপরাধের যত লাঞ্চনা তাহাই কেন ভোগ করব, আর অপরাধের যত সুখ তাহা হইতে কেন বঞ্চিত হইবো?"[৯]

বঙ্কিম যখন বিষবৃক্ষের নারীকে অভিশাপ দিয়ে অন্দরমহলের অন্ধকারের ভিতরে লুকিয়ে রেখছেন, তাঁর জীবনের শতপ্রনোদিত ফুলকে ফুল হয়ে ফোটার আগেই ঝড়িয়ে দিয়েছেন; সেখানে রবীন্দ্রনাথের বিনোদ অচলার আগমনের পূর্বেই নারীকে তার অন্দর বাহির সমস্ত রাজত্ব ফিরিয়ে দিয়ে পাঠকের কারখানা ঘরে নিজের আঁতের কথাকে গেঁথে দিয়ে এসেছে। সেই পেরেকে বিদ্ধ হয়ে একবিংশর পাঠককুল বুঝতে পারে দুই নারী যদি সধবা হয়েও নিরুৎচারে বিধবার একাদশী পালন করে তাহলে বিনোদ তাদের সেই বিধবা জীবনের ইতিকথায় লঙ্কা-মরীচের স্বাদ নিয়ে আসে। যখন শরৎবাবু অচলাকে দুই বন্ধুর মাঝে পেণ্ডুলামের মতো দুলিয়ে যেকোনো একজনকে বেছে নেওয়ার প্রশ্নে বদ্ধ ঘরে একাকী অসহায়কে সঙ্গী করে দিয়েছেন; যখন বঙ্কিম কুন্দর জীবনে বিবাহের মতো সিদ্ধান্তের সময়ে তাকে পুরোপুরী নেপথ্যে রেখে দ্বিতীয় সীতা বিসর্জনের নীরব পথে ঠেলে দিয়েছেন তখন রবীন্দ্রনাথের বিনোদ এই দুই নারীর জীবনে জন্ম নেওয়া আলোড়নকে ভয়ে উপেক্ষা করেনি; বরং তাকে সঙ্গে নিয়েই সমাজের সমস্ত অভিযোগ থামিয়ে দিয়ে বলেছে শোনো, আমি প্রথমে মানুষ তারপর পত্নী, তারপর প্রেমিকা।

বঙ্কিমের কুন্দ যেখানে বিধবা জীবনের 'না' শব্দকে নির্দ্বিধায়, নিরুৎচারে নিজের ভবিতব্য বলে মেনে নিয়েছে; শরৎ-এর অচলা যেখানে পুরুষ ও পুরুষতান্ত্রিক সমাজের পদতলে শেষপর্যন্ত চোখের জলে নিজেকে অ-চলা-ই করে রেখে দিয়েছে সেখানে রবির বিনোদ তাদের ওপর হওয়া অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে একদিকে যেমন কুন্দর জীবনে 'না' শব্দকে challenge ছুঁড়ে দিয়েছে অন্যদিকে তেমনি অচলার জীবনে অত্যাচারী পুরুষ ও পুরুষতান্ত্রিক সমাজকে তার পায়ের তলায় এনে ফেলেছে।

বঙ্কিম যখন প্রত্যেক পরিচ্ছেদের শেষে গল্পের নীতিকথা বোঝাতে পাঠককে কোনো ঈঙ্গিত দেওয়ার পরিবর্তে নিজের পরিণতিকেই স্পষ্ট করে তোলেন সেখানে শরৎচন্দ্রের পাঠক পরিচ্ছেদের শেষে এক পরিণতিতে পৌঁছাতে চাইলেও তাকে আবার তিনি ঘুলিয়ে দিয়ে সূচনা থেকে পুনরায় ভাবাতে বসান। তাই আমি মজা করে বলি বঙ্কিম যদি শরৎ- এর রোমান্টিকতার আশঙ্খায় দ্বার রক্ষীর ভুমিকায় অবতীর্ন হয়ে পাঠককে বলেন সাবধান! তফাৎ যাও তাহলে রবীন্দ্রনাথ সেখানেই পাঠকের জন্য এক বৃহৎ জায়গা ছেড়ে দিয়ে দুই হাত বাড়িয়ে কাছে ডেকে বলতে শেখান- বলো, যা পেয়েছি তা কুড়িয়ে নাও।

চন্ডীমন্ডপের আসর শেষে উপসংহার টানতে পাঠক যদি একবারের জন্য তিন নারীকে পাশাপাশি বসিয়ে শেষবারের মতো প্রশ্ন করে- 'যদি বলো কি পেয়েছি' তাহলে তার উত্তর যদি কুন্দর কাছে শুধু দীর্ঘশ্বাস হয়, যদি অচলার কাছে তার স্বামী সোহাগ মেশানো কথাগুলো আশ্রয়ের শেষ অবলম্বন হয়,

তাহলে বিনোদ এদের দুজনকেই উপেক্ষা করে জীবনের হিসেব নিকেশের খাতায় একবার চোখ বুলিয়ে নিশ্চয় বলবে আচ্ছা- 'আমি যাহা ছাড়িব তাহার বদলে আমি কি পাইব?'

প্রবন্ধের উপসংহারে এসে বলতে পারি মনের টানে নিয়মের পাড় ভাঙ্গে, বাঁক বদল হয় সম্পর্কের। তবু পরকীয়ার সেই চোরাস্রোত আবহমান সময়ের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে মিশে থাকে। সেই স্রোতের টানে কুন্দ-বিনোদ-অচলারা ভেসে চলে, তোলপাড় হয়, স্থিতি খোঁজে জীবনের। তাদের এই অশান্ত জীবনকে শান্ত করতে পাঠক নিজেদের বুঝিয়ে চলে কালের চাহিদা মেনে সমাজের বদল ঘটে। সে বদল ইতিহাসের বার দুয়ার পেরিয়ে সাহিত্যের অন্দর মহলে প্রবেশ করে। সেই প্রবেশ মাত্রই একদিকে যখন বহু বিবাহ ও বিধবা বিবাহের দ্বন্দ্ব সংঘাতে দুলে ওঠে গৃহস্থ জীবনের ভিত্তিভূমি; বঙ্কিমের কলমে জন্ম নেয় বিষবৃক্ষের। অন্যদিকে তখন অবৈধ প্রেমের জালে জড়িয়ে অভিসম্পাতের ভার সহ্য করতে না পেরে শরৎ- এর হাতে ঘটে যায় অচলার গৃহদাহ। কিন্তু দুই নারীর জীবনের বিচার রায় রয়ে যায় এক প্রশ্ন চিহ্নের মুখে। তাই পাঠকের মন যে তাদের পরিণতিকে মেনে নিতে বড়ো অবাধ্য হয়ে ওঠে। এই সংঘাতের সমাধান করতে মনস্তত্ত্বের দৃষ্টিকোন থেকে সমাজের অনুবীক্ষণ যন্ত্রে চোখ রেখে রবীন্দ্রনাথ খুঁজে ফেরেন মানব মনের আর্তি, আকুতি, ক্ষত ও পরিত্রাণের স্বরূপগুলিকে। তাতে ব্যক্তিত্বের সংঘাত নাটকীয়তাকে ঘনিয়ে তোলে, না বলা কথাগুলো উঠে আসে চিঠির অক্ষরে, বিধবা বিবাহ ও পরকীয়ার জটপাকানো সুতোটাকে নিয়ে আরও একবার ভাবতে বসে তিন শিল্পীর অনুভাবী মন। এই তিন উপন্যাসকে কেন্দ্র করে সেই তিন মনেরই বিশ্লেষণ ধরা থাকলো আমার এই দুই মলাটের প্রবন্ধের মধ্যে।

তথ্যসূত্র:

১. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, সম্পা. বন্দোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ, দাস, সজনীকান্ত, বৃষবিক্ষ, কলকাতাঃ বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ১৯৬০, পৃষ্ঠা নং-৩২.
২. তদেব, পৃষ্ঠা নং-৭৭.
৩. তদেব, পৃষ্ঠা নং-৯১.
৪. ভট্টাচার্য, বিশ্ববন্ধু, গৃহদাহ, কলকাতাঃ প্রজ্ঞাবিকাশ, পরিমার্জিত সংকরণ, ২০১৬. পৃষ্ঠা নং-২১.
৫. চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র, গৃহদাহ, কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশার্স, ২০০০, পৃষ্ঠা নং-৩২.
৬. তদেব, পৃষ্ঠা নং-১৯০.
৭. ঠাকুর, রবিন্দ্রনাথ, চোখের বালি, কলকাতাঃ বিশ্বভারতী, ১৯০৫, পৃষ্ঠা নং-৭৩-৭৪.
৮. চট্টোপাধ্যায়, হীরণ, চোখের বালি, কলকাতাঃ বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১৪. পৃষ্ঠা নং-১৭.
৯. ঠাকুর, রবিন্দ্রনাথ, চোখের বালি, কলকাতাঃ বিশ্বভারতী, ১৯০৫, পৃষ্ঠা নং-১৪৪-১৪৫.

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী:

১. বন্দোপাধ্যায়, কল্যানী, নারী, শ্রেনী ও বর্ণঃ নিম্ন বর্গের নারীর আর্থসামাজিক অবস্থান, কলকাতাঃ ২০০৯.
২. বিশ্বাস, কৃষ্ণকলি, স্বাধীনতা সংগ্রামের মঞ্চে ভারতের নারী, কলকাতাঃ ১৯৮৭.

৩. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, বৃষবিক্ষ, কলকাতাঃ বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ১৮৭৩,
৪. চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র, গৃহদাহ, কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশার্স, ২০০০,
৫. চট্টোপাধ্যায়, হীরণ, চোখের বালি, কলকাতাঃ বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১৪.
৬. গুপ্ত, শ্যামলী, নারী আন্দোলনের বিভিন্ন ধারা, কলকাতাঃ দীপ প্রকাশন, ২০০৭.
৭. ঠাকুর, রবিন্দ্রনাথ, চোখের বালি, কলকাতাঃ বঙ্গদর্শন, ১৯০৩,
৮. ভট্টাচার্য, সুকুমারী , প্রাচীন ভারতে নারী ও সমাজ, কলকাতাঃ গাঙচিল, ২০০২.
৯. ভট্টাচার্য, বিশ্ববন্ধু, গৃহদাহ, কলকাতাঃ প্রজ্ঞাবিকাশ, পরিমার্জিত সংকরণ, ২০১৬.
১০. মন্ডল, নিত্যাণন্দ, বিষবৃক্ষ, কলকাতাঃ বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১৪.